প্রথম আলো

কলাম

মতামত

মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতি এত অবহেলা কেন

নজরুল ইসলাম

আপডেট: ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৯: ১০

বাড়ি ভাড়া বাড়ানোর পর শিক্ষকদের আন্দোলন প্রত্যাহার। *ছবি: প্রথম আলো*

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা। সেখানে শিক্ষার মান, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষকদের মূল্যায়ন, বরাদ্দসহ বিভিন্ন জায়গায় নানা অবহেলা বিদ্যমান। মাধ্যমিক শিক্ষার সংকট নিয়ে লিখেছেন নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটি ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য হলো মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতি সরকারের অবহেলা। প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারি স্কুলের প্রাধান্য বিরাজ করে। এ পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ৬৭ দশমিক ১ শতাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বাকি ৩২ দশমিক ৯ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে।

উচ্চশিক্ষা (তথা ব্যাচেলর ও মাস্টার ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষার) দিকে তাকালে আমরা দেখি, ব্যক্তি খাতে ১০৮টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও ৬৪ দশমিক ৫ শতাংশ শিক্ষার্থী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত। যদি মাধ্যমিক (এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ের) শিক্ষার দিকে তাকাই, তাহলে দেখি, মাত্র ৭ দশমিক ৩ শতাংশ শিক্ষার্থী সরকারি প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত এবং বাকি ৯২ দশমিক ৭ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করে।

এ বৈপরীত্যের কারণ বুঝতে হলে নিশ্চয়ই বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসে যেতে হবে। কিন্তু কথা হলো, ইতিহাস যাই হোক না কেন, স্বাধীনতার এত বছর পরও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতি এরূপ বৈষম্য কেন অব্যাহত থাকছে?

এ প্রশ্নের উত্তরে সরকারি মহল থেকে নিঃসন্দেহে বলা হবে যে উপর্যুক্ত পরিসংখ্যান মাধ্যমিক শিক্ষায় সরকারের ভূমিকা সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে না। কারণ, বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের পারিতোষিকের একটি অংশ সরকারি তহবিল থেকে প্রদান করা হয়। এ বন্দোবস্তের নাম ‘মান্থলি পে অর্ডার (এমপিও)’ বাংলায় বলা যেতে পারে ‘মাসিক বেতন আদেশ (মাবেআ) ’।

এমপিও বন্দোবস্তে সরকারের অধীন নিবন্ধিত মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মূল বেতন সরকারি তহবিল থেকে দেওয়া হয় এবং তাঁদের পারিতোষিকের বাকি অংশ (ভাতা, অন্যান্য সুবিধাদি) এসব প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব তহবিল থেকে প্রদান করতে হয়। সরকারসূত্রের মূল বেতন পাওয়ার জন্য এই শিক্ষকদের ‘বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন এবং প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষ’-এর অধীন নিবন্ধিত হতে হয়।

এমপিও ব্যবস্থার একটি প্রত্যক্ষ ফল হলো বৈষম্য। কারণ, সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের তুলনায় এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কম ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পান এবং অনেক সময় পানও না। সামগ্রিকভাবে এ বন্দোবস্তের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষকদের মধ্যে একটি শ্রেণি বিভাজনের সৃষ্টি হয়েছে, যা বাঞ্ছনীয় নয়।

সুতরাং আশ্চর্যের নয় যে এমপিওভুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষকদের মধ্যে বহুদিন ধরে অসন্তোষ বিরাজ করছে। তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় সমাধান হলো মাধ্যমিক শিক্ষার জাতীয়করণ। অর্থাৎ সব মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা।

এটা করা হলে বর্তমানের দ্বৈততার অবসান ঘটবে এবং এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ‘দ্বিতীয় শ্রেণির’ শিক্ষক বলে পরিগণিত হতে হবে না। তাঁদের বেতন-ভাতা নিয়ে অনিশ্চয়তা দূর হবে। তাঁরা মর্যাদাবান বোধ করবেন এবং শিক্ষাদানের প্রতি পরিপূর্ণভাবে মনোযোগী এবং নিবেদিত হতে পারবেন।
(মাধ্যমিক) শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণের এ দাবি সরকার এ পর্যন্ত অগ্রাহ্য করেছে। বিদেশি ‘দাতা’ সংস্থাসমূহের ব্যক্তিকরণের সার্বিক চাপ এ ক্ষেত্রে একটি প্রভাবক হিসেবে কাজ করে থাকতে পারে। ফলে সরকারের পক্ষে জাতীয়করণের দাবিটি প্রত্যাশিত মনোযোগ পায়নি। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পর একটি সুযোগের সৃষ্টি হয়েছিল দেশের শিক্ষা খাতের পুঞ্জীভূত সমস্যাবলি নিরীক্ষণ করে একটি মোড় পরিবর্তনমূলক কর্মপরিকল্পনা অথবা সুপারিশমালা প্রণয়ন করার।

কিন্তু সরকার প্রায় এক ডজন সংস্কার কমিশন গঠন করলেও শিক্ষাবিষয়ক কোনো কমিশন গঠন করেনি। ফলে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সমস্যার সার্বিক সমাধানের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়। এমতাবস্থায় তাঁরা কতগুলো সুনির্দিষ্ট দাবি নিয়ে আন্দোলন করছেন। এর মধ্যে রয়েছে মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া, ১ হাজার ৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা ও কিছু উৎসব ভাতা। অনেক দিন ধরে এসব দাবি নিয়ে খণ্ডকালীন আন্দোলন করার পর এবার তাঁরা ঢাকায় এসে হাজির হন এবং লাগাতার আন্দোলন শুরু করেন।

শিক্ষকদের লাঠিপেটাসহ বিভিন্নভাবে হেনস্তা করা হয়। তা সত্ত্বেও শিক্ষকেরা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার মাত্র ৫ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতা দিতে সম্মত হয়। সেটি মেনে না নিয়ে শিক্ষকেরা আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে ছিন্নমূলের মতো ঢাকায় এসে অবস্থান করা, শহীদ মিনার থেকে শাহবাগ, শাহবাগ থেকে যমুনা, যমুনা থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে শহীদ মিনার—শিক্ষকদের এই সাফা-মারওয়া দৌড়াদৌড়ি নিশ্চয়ই প্রীতিকর কিছু নয়। কিন্তু তাঁরা যে এটা করতে বাধ্য হয়েছেন, তা থেকে তাঁদের বেপরোয়া পরিস্থিতি পরিষ্কার বোঝা যায়।

অবশেষে তাদের বাড়িভাড়া মূল বেতনের ১৫ শতাংশ (ন্যূনতম দুই হাজার টাকা) করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। শিক্ষকেরাও এ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে আন্দোলনের ইতি টেনে ক্লাসরুমে ফিরে গেছেন।

নিশ্চয়ই জাতীয়করণকৃত শিক্ষাব্যবস্থা দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা একটি চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশে দুর্নীতি যেভাবে রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে এবং একটি গভীর প্রোথিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাতে সরকারি স্কুলে অপচয় ও দুর্নীতির আশঙ্কা থেকেই যায়। কিন্তু দুর্নীতি ও অদক্ষতার কাছে আত্মসমর্পণ এ সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান দুর্দশাকর ত্রিখণ্ডিত অবস্থা। এর প্রতিফল ও তা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় সম্পর্কে আমার সম্প্রতি প্রকাশিত আগামী বাংলাদেশের দশ করণীয় গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ নিবন্ধের

স্বল্প পরিসরে তার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বলা দরকার যে পৃথিবীর প্রায় সব উন্নত দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে সরকারি খাতে পরিচালিত হয়। ইউরোপের উন্নত দেশসমূহে, এমনকি উচ্চশিক্ষাও প্রায় সম্পূর্ণরূপে সরকারি খাতে ন্যস্ত। প্রতিবেশী ভারতেও মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় ৭০ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকারি খাতে।

বাংলাদেশের মতো দেশে জনগণকে শিক্ষিত এবং দক্ষ শক্তিতে পরিণত করাই সরকারের মূল দায়িত্ব। মাধ্যমিক (এইচএসসিসহ) পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা পুরোপুরি সরকারি খাতে পরিচালনা করাই এ করণীয় সম্পাদনের প্রকৃষ্ট পন্থা। সুতরাং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার জাতীয়করণ একটি সংগত দাবি।

দেশের সব শিশু ও তরুণের মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বাধ্যতামূলক এবং বিনা বেতনে সুশিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্য অর্জনের জন্য এটাই উপযোগী পন্থা। এরূপ একটি একীভূত শিক্ষাব্যবস্থা নতুন প্রজন্মের মধ্যে একটি অভিন্ন জাতিসত্তা সৃষ্টি করে। এ বয়স হলো মনোগঠনের বয়স। এ বয়সেই যদি তারা পারিবারিক আয়, ধর্ম, ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভাজিত হয়ে পড়ে, তবে তাদের মধ্যে অভিন্ন জাতিসত্তার উপলব্ধি এবং জাতীয় সহমর্মিতা সবল হতে পারে না।

জাতি গঠনে একীভূত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ভূমিকার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকজন এসে যুক্তরাষ্ট্রে বসতি গড়েন। কিন্তু অভিন্ন, সরকারি প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলগুলোর মাধ্যমে তাঁদের সন্তানেরা সবাই ‘মার্কিন’ হয়ে ওঠে।

নিশ্চয়ই জাতীয়করণকৃত শিক্ষাব্যবস্থা দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা একটি চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশে দুর্নীতি যেভাবে রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে এবং একটি গভীর প্রোথিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাতে সরকারি স্কুলে অপচয় ও দুর্নীতির আশঙ্কা থেকেই যায়। কিন্তু দুর্নীতি ও অদক্ষতার কাছে আত্মসমর্পণ এ সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

শিক্ষাব্যবস্থার খণ্ডিকরণের বর্তমান প্রক্রিয়া সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য সমস্যা আরও তীব্র করবে। কারণ, সমাজের এলিট শ্রেণির সদস্যরা তাঁদের সন্তানদের ব্যয়বহুল ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠাবেন এবং সরকারি স্কুলসমূহের পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও উদাসীন হবেন।

পক্ষান্তরে যদি এলিট শ্রেণির সন্তানদেরও সরকারি স্কুলে যেতে হয়, তাহলে এই শ্রেণি সরকারি স্কুল ব্যবস্থার মানোন্নয়নে সচেষ্ট হবে এবং সে জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, তদারকি নিশ্চিত করা, ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণে প্রয়াসী হবে। ফলে গোটা জাতি উপকৃত হবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার জাতীয়করণ কি দুঃসাধ্য কোনো লক্ষ্য? ২০২৩ সালে প্রতিবেশী ভারত ও ভুটান শিক্ষার জন্য ব্যয় করেছে জিডিপির যথাক্রমে ৪ দশমিক ১২ ও ৫ দশমিক ৮৫ শতাংশ। সে তুলনায় বাংলাদেশের ব্যয় ছিল মাত্র ১ দশমিক ৭৮ শতাংশ। ভারত ও ভুটানের তুলনায় (যথাক্রমে ২০ দশমিক ৮ ও ২৪ দশমিক ২৫ শতাংশ) বাংলাদেশের রাজস্ব-জিডিপি অনেক কম (মাত্র ৮ দশমিক ২১ শতাংশ) হওয়ার কারণে সরকারের বাজেটের

অনুপাত হিসেবে শিক্ষার জন্য বাংলাদেশের ব্যয় বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু আমরা দেখি, এ ক্ষেত্রেও ভারতের ১৪ দশমিক ২ ও ভুটানের ১৭ দশমিক ২ শতাংশের তুলনায় চেয়ে বাংলাদেশের জন্য এই অনুপাত কম, ১০ দশমিক ৭ শতাংশ।

বাংলাদেশের ২০২৪-২৫ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার জন্য মোট বরাদ্দ হয়েছে ৪৪ হাজার ১০৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে মাধ্যমিকের জন্য কত বরাদ্দ, তা আলাদা করে উল্লিখিত নয়। যাহোক মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা একত্র করেও বরাদ্দ মোট বাজেটের মাত্র ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। ধরা যাক, এর অর্ধেক মাধ্যমিকের জন্য। সে ক্ষেত্রে মাধ্যমিকের জন্য মোট বরাদ্দ দাঁড়াবে ২২ হাজার ৫৫ কোটি টাকা, তথা বাজেটের ২ দশমিক ৭৫ শতাংশ।

এটা ভাবা কঠিন যে এ স্বল্প শতাংশের বাজেটের এমন কিছু বৃদ্ধি সম্ভব নয়, যার মাধ্যমে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের সব দাবি পূরণ করা সম্ভব। লক্ষণীয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্য বরাদ্দ হলো ৩৮ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা। বাধ্যতামূলক মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষানীতির অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রাথমিকের চেয়ে খুব পৃথক হওয়ার কথা নয়। সে দৃষ্টিকোণ থেকেও মাধ্যমিকের জন্য বরাদ্দের স্বল্পতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দেশে এখন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫০। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা আনুমানিক ১৫০। মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দুই শতাধিক। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যে অভিযোগের কথা শোনা যায় তা হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের নিম্নমান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতির অভাব।

সুতরাং উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই বিপুল বৃদ্ধি অনেকটা ‘গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালা’র মতো। লক্ষণীয় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার গুরুত্ব এক অর্থে প্রাথমিক পর্যায়ের চেয়েও বেশি। কারণ, প্রাথমিক পর্যায়ে ঘাটতি থাকলে তা মাধ্যমিক পর্যায়ে পূরণের সুযোগ থাকে। কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ে যদি গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি থেকে যায়, তাহলে তা বহুলাংশে স্থায়ী চরিত্র গ্রহণ করে। সে কারণে বাংলাদেশের মানবসম্পদ বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার প্রতি অবহেলা বহুলাংশে আত্মহত্যার শামিল।

এমপিও শিক্ষকদের দাবি খুব বেশি কিছু ছিল না। তাঁদের অনেকের মোট মাসিক বেতন আনুমানিক ১০ হাজার টাকা। ঢাকা শহরের অনেক গৃহকর্মীই এখন এই পরিমাণ পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত ইতিবাচক। তাদের অন্যান্য দাবিগুলো নিয়েও ভাবা উচিত এবং দীর্ঘ মেয়াদে গোটা মাধ্যমিক শিক্ষার জাতীয়করণের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। একটি কমিশনের মাধ্যমে এ আলোচনার সূত্রপাত করা গেলে ভালো হতো। তবে অন্যভাবেও সেটা শুরু করা যেতে পারে।

- **নজরুল ইসলাম** অধ্যাপক, এশীয় প্রবৃদ্ধি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং জাতিসংঘের উন্নয়ন গবেষণার সাবেক প্রধান

*মতামত লেখকের নিজস্ব

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো